বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.003

হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* : জীবনবাস্তবতার শিল্পিত আখ্যান

নূর নাহার শারমিন সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জগতে হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) এক প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্ব। বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ। প্রধানত গল্পকার হিসেবে প্রাধান্য পেলেও উপন্যাস রচনায়ও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর যে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময় পরিসরে তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং সাহিত্যভুবনে পদার্পণ সেই সময়, সমাজ ও ইতিহাসকে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যজগৎ। একজন শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি সমসাময়িক সমাজ ও জীবনের কথা তাঁর গল্প ও উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। *আগুনপাখি* তাঁর এক অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি যাতে সাধারণ এক পল্লি নারীর আত্মকথার আদলে এদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বকে তুলে ধরেছেন হাসান আজিজুল হক। বিশ শতকের প্রথম ভাগে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও দেশভাগের পটভূমিতে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে সাম্প্রদায়িকতা, মন্বন্তর ও রাজনৈতিক টানাপড়েনের অভিঘাত কেমন হয়েছিল তারই এক শিল্পিত বয়ান *আগুনপাখি*। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং প্রতিফলিত জীবনবাস্তবতা বিশ্লেষণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

চাবি শব্দ : *আগুনপাখি*, দেশভাগ, মন্বন্তর, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা।

হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* বাংলা সাহিত্যের ভুবনে এক অসামান্য সংযোজন। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। এর আগে অর্ধেকাংশ 'অপ-রূপকথা' নামে 'দৈনিক প্রথম আলো' ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাস আকারে প্রকাশের সময় নাম পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের ব্যাখ্যা, 'এখানে ধ্বংসের মধ্যে পুনর্জাগরণের একটা আভাস পাওয়া যায়। আর অপ-রূপকথার মধ্যে হতাশার ছায়া আছে। আর আমার এ উপন্যাসের কাহিনি তো মোটেও রূপকথা নয়–বরং নির্জলা বাস্তব।'[১] একইসঙ্গে এ উপন্যাসের মূল চরিত্র যে তাঁর মা সেটিও উল্লেখ করেছেন হাসান আজিজুল হক। উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে তাঁর ভাষ্য, 'বর্ধমানে আমার যে ফেলে আসা বসতবাড়ি, শৈশব-তারুণ্যের স্মৃতি, পারিবারিক-সাংসারিক চালচিত্র, রাঢ়ের গ্রাম্য মুসলমান গৃহস্থ পরিবারের উত্থান-পতন, মা-বাবার কথা, দেশভাগের নির্মমতা, সাধারণ মানুষের ওপর এর অভিঘাত–এই সবকিছু প্রেক্ষাপটে রেখে একটি উপন্যাস আমার লেখা উচিত। এভাবেই আগুনপাখি লেখার শুরু।'[২] লেখকের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপলব্ধি এবং নিজ জীবনের প্রতিফলন রয়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের কথক নারীর চরিত্রটি তাঁর জন্মদাত্রী মা জহুরা খাতুনের আদলেই গড়ে তোলা হয়েছে। পুঁথিগত শিক্ষায়

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শিক্ষিত না হলেও সমাজ-সমকালের নানা জটিল বিষয় সম্বন্ধে জহুরা খাতুনের ছিল স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা। ধীশক্তি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়তার সুবাদে জীবন ও জগৎকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল এ নারীর, যা *আগুনপাখি* উপন্যাসে নামহীন কথকের মধ্যেও দেখতে পাই। বস্তুত, *আগুনপাখি* উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর নিজ পরিবারের গল্পই বর্ণনা করেছেন হাসান আজিজুল হক। দেশভাগের কারণে সৃষ্ট যন্ত্রণা ও স্বপ্নভঙ্গকে তিনি স্থাপন করেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে।

উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে দেশভাগ পর্যন্ত গ্রামীণ সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ শতকের বৈশ্বিক ও আন্তর্দেশিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রভাবে গ্রামের সহজ-সরল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিস্তরঙ্গ জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে তারই এক বিশ্বস্ত দলিল এই উপন্যাস। বাংলার রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দুর্দশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার অনুপুঙ্খ বিবরণ, বর্ধমান-বাঁকুড়া অঞ্চলের এক গ্রামীণ নারীর জবানিতে বর্ণিত– যে নারীর জীবন বহুলাংশেই সীমিত ছিল বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে। উপন্যাসের ঘটনার উন্মোচনও ঘটেছে কথক তথা এ নারীর মায়ের মৃত্যুর বর্ণনার মধ্য দিয়ে। মায়ের মৃত্যুর সময় কথকের বয়স আট কি নয় বছর। এরপর যখন তার বয়স চৌদ্দ-পনেরো তখন তার বিয়ের সম্বন্ধ এলো। পাত্রের বয়স আটাশ। সম্বন্ধ ভালো, নামজাদা বংশ, অর্থ-সম্পদও অনেক। নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয়েও গেল। স্বামী-শাশুড়ি, ননদ-দেবরদের নিয়ে বাড়-বাড়ন্ত সংসার। তার স্বামী সংসারের মেজ পুত্র হলেও তিনিই পরিবারের কর্তা, যিনি তার পিতার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেছিলেন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সহজ-সরল মেয়েটি একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের গৃহবধূ। শাশুড়ি আড়ালে-আবডালে বলেন– 'ঐ মেজবউ সংসারের লক্ষ্মী, এ বউটি আসা থেকে সংসারের বাড়-বাড়ন্তের শুরু হয়েছে। খুব পয়া আমাদের বউ।' স্বামী-শাশুড়ি-দেবর-ননদ সবাইকে নিয়ে সুখের সংসার কথকের। ক্রমে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের বিবর্তন ঘটে। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাস্তবতার ছায়াপাত ঘটতে থাকে কথকের পরিবার, সমাজ, পরিপার্শ্বে। আর তারই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশ নাকি স্বজন–এমন এক কঠিন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয় কথককে, যা তার জীবনের চূড়ান্ত গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়।

বিশ শতকের সূচনা পর্বটি বাংলার ইতিহাসে একটি ঘটনাবহুল সময়। এ সময় উল্লেখযোগ্য নানা ঘটনার অভিঘাতে বাঙালির মনোলোকে ঘটে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলে বঙ্গভঙ্গ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের দাবির মুখে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করলেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দুসমাজের জন্য এ সিদ্ধান্ত ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের শামিল। তারা আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো দিক থেকেই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। ফলে হিন্দু সমাজের মনোলোকে বঙ্গভঙ্গ তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করলো। তারা নানাভাবে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল। এদিকে অধিকাংশ মুসলিম বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতেও বড় ধরনের ধাক্কা লাগলো। ফলে সহিংস হয়ে ওঠা আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে। এই ঘটনা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে সৃষ্টি করে গভীর হতাশার।

এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাংলার সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষভাবে রেখাপাত না করলেও ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালব্যাপী সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এটি ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। এই যুদ্ধে বিশ্বজুড়ে সাত কোটিরও বেশি সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যের প্রাণহানি ঘটে। যুদ্ধের অভিঘাতে গ্রামবাংলার জনসাধারণের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় মেদেনীপুরের ঝড় (অক্টোবর ১৯৪২) এবং দামোদরের বন্যা (১৯৪৩)। এই পরিস্থিতির ফলে অনিবার্য হয়ে ওঠে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর। বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিভীষিকাময় ঘটনা হচ্ছে মন্বন্তর। কখনো মানবসৃষ্ট আবার কখনো-বা প্রাকৃতিক কারণে ঘটেছে এগুলো। এদেশের ইতিহাসে দুটি মন্বন্তর ভয়াবহতার বিচারে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমটি ঘটে বাংলা ১১৭৬ সালে, যেটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত, আর দ্বিতীয়টি ঘটে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রি.), যেটি 'তেতাল্লিশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ছিল ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় সদ্য জেঁকে বসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসন, যেটি প্রায় দেড় কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। অপরপক্ষে তেতাল্লিশের মন্বন্তর সংঘটিত হয় ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন। এই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশদের গৃহীত পদক্ষেপ, শাসননীতিসংক্রান্ত দুর্বলতা, উৎপাদনবৃদ্ধির অসমর্থতা ইত্যাদি যুক্ত। জাপান কর্তৃক বার্মা দখল (১৯৪২) ও কলকাতায় বোমাবর্ষণের (১৯৪২) পর বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে সেখান থেকে নিঃস্ব অবস্থায় বিপুলসংখ্যক ভারতীয় ফিরে আসেন এ-অঞ্চলে। যুদ্ধপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রচুর বিদেশি সৈন্যের আগমন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার অভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী বাংলায় আনা কঠিন হয়ে পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কালোবাজারিরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে তৎপর হয়ে ওঠে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং জনজীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। কেবল বাংলাতেই আনুমানিক ৩৫ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এছাড়া সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ, যার অভিঘাত সুদীর্ঘ সময় ধরে অনুভূত হয়। শহরাঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থার কারণে মন্বন্তরের প্রভাব কিছুটা প্রশমিত হলেও বাংলার গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ মানবিক সংকট। খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, দীর্ঘস্থায়ী আর্থ-সামাজিক সংকট ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ছিল এই মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ও ফল। গবেষকের ভাষায়,

> দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতি বাংলার কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিকে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর করে দিতে থাকে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে বেকার সমস্যা। যুদ্ধ শুরু হতেই ব্রিটিশ শাসক মিত্রপক্ষের সৈনিকদের জন্য যুদ্ধের রসদ মজুত করবার প্রয়োজনে সংগ্রহ ও গুদামজাত করতে থাকে খাদ্য। মজুতদারদের তৎপরতা বাড়ে, বেড়ে যায় চোরা কারবার। রেশনিং ব্যবস্থা চলে যায় অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে। কন্ট্রোলের নামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে উধাও করে দিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছিল কালোবাজারী ব্যবসায়ের দল। অথচ যুদ্ধের প্রয়োজনে খাদ্যশস্য রপ্তানি সমানেই চলতে থাকে। দেশের মানুষের দুর্দশায় চোখ বুঁজে থাকে বিদেশী সরকার।[৩]

অনাহারে মানুষের মৃত্যু, নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, মানবেতর জীবনযাপন, বাস্তুভিটা ত্যাগ, বিবেকহীন মুনাফালোভীদের অপতৎপরতা, পারিবারিক বন্ধনের অবক্ষয়, নারীত্বের অবমাননা–মন্বন্তরের কালে এসবই ছিল সমাজের সাধারণ চিত্র। মন্বন্তরের ধারাবাহিকতায় মানুষের জীবনে নেমে আসে বস্ত্রসংকটের মতো নির্মম এক মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। অধিক মুনাফালোভী এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী এই সংকট সৃষ্টির মূল কুশীলব। অসহনীয় এ সংকটের তীব্রতা গবেষকের মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'লজ্জানিবারণের অপারগতায় অসহায় আর্ত নরনারীর ক্রন্দনসিক্ত চিৎকারে বিদীর্ণ হয় সভ্যতার বিবেক।'[৪]

সারাদেশে যখন খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকটের বিভীষিকাময় হাহাকার, ভেঙে পড়েছে পুরো অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা সে সময় আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ঘটনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলার গ্রামীণ জনপদে পাশাপাশি বাস করে আসছে। তারা ধর্মভীরু হলেও কখনোই পরধর্মবিদ্বেষী ছিল না। এদেশের প্রাচীন ইতিহাসও সেই সাক্ষ্য দেয়। রাজ্য-রাষ্ট্রের নানা পালাবদলের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এদেশের গ্রামাঞ্চলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে অংশ নিয়েছে। তবে ইংরেজ শাসন এদেশে জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে বিভেদের বীজ উপ্ত হয় যা ছিল বস্তুত ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদেরই একটি দুরভিসন্ধি। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদেশে হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণ স্পষ্ট হতে থাকে, সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য। সূচনা ঘটে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার, বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যা ছিল বেদনাদায়ক এক ব্যতিক্রম। 'বিশ শতকের প্রথম ভাগেই দেখি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে শুধু স্বাজাত্যবোধ নয়, স্পষ্ট চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক চেতনায়। এমন সব বিষয় দাবি বা অধিকার হিসাবে নিয়ে আসা হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের চেতনাকেও স্পর্শ করতে পারে। সম্প্রদায়ের জায়গায় আসছে 'জাতি'র ধারণা।'[৫]

'সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনা বাঙালি মুসলিম-মানসে যে সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য চেতনার জন্ম দিয়েছিলো, তাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫-এর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নির্বাচন এবং ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।'[৬] এ সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-এর পরস্পর-বিরোধী আন্দোলন দু'টি দলের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের মধ্যেও বিভক্তির সৃষ্টি করে। সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটে, জাতিবিদ্বেষী আচরণ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এরই পরিণতিতে ১৯৪৬ সালে সংঘটিত হয় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এ দাঙ্গা দীর্ঘস্থায়ী এক বিভেদ ও পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কেবলমাত্র হিন্দুপ্রধান শহরগুলিতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মুসলিমপ্রধান গ্রামগুলো ছিল শান্তিপূর্ণ। শহরের এসব ঘটনায় ক্রমে গ্রামের মানুষের মানসিক শান্তিও বিঘ্নিত হতে শুরু করল; ফলে ১৯৪২ সালের শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল।[৭]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা, জাপান কর্তৃক এদেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা নিক্ষেপ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি নানা ঘটনায় ব্রিটিশ শাসকদের অজেয় ভাবমূর্তিতে দাগ পড়ে এবং ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে লেবার দলের নিরঙ্কুশ বিজয় ঘটে। প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ভারতবর্ষের চলমান অচলাবস্থা দূর করার জন্য কেবিনেট মিশন প্রেরণ করেন। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মতপার্থক্য তীব্র আকার ধারণ করে। এই বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় শুরু হয় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, যা ক্রমে বিহার ও পূর্ববঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে। ভয়াবহ এই দাঙ্গা হিন্দু-মুসলিম মিলনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষাকে সুদূরপরাহত করে তোলে। ফলে শরৎ বসু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসও অখণ্ড ভারতের ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এরই ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর এভাবেই বৃহৎ বাংলার বাঙালিরা দুটি পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রত্যন্ত এক গ্রামের অধিবাসী সাধারণ গৃহস্থ এক নারীর জবানিতে *আগুনপাখি* উপন্যাসের ঘটনাবর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবনে সামন্ত সমাজের ভাঙন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাকার ঘটনার প্রভাবকে একান্তই বাস্তব, মাটি-গন্ধমাখা এক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে রাজনীতির জট-জটিলতা নেই, নেই মতাদর্শিক বিচার-বিশ্লেষণের দূরতম প্রভাব। কিন্তু যেসব সাধারণ মানুষের দোহাই দিয়ে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির কূটকচালি পরিচালিত হয় তাদেরই প্রতিনিধি–বাংলার আটপৌরে এক নারীর জীবনের নানা ঘটনা এবং তার মানবভাবনা সমাজ ও রাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার অভিঘাতকে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করে। অকৃত্রিম এক আঞ্চলিক বচনে নিজের মায়ের মৃত্যু থেকে শুরু হওয়া ঘটনাপঞ্জির বয়ান দিয়েছেন প্রৌঢ়া এই নারী। পরিবার ও সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার বিবরণের মধ্য দিয়ে সে সময়ের গ্রামীণ নারীদের জীবন সম্বন্ধে পূর্বাপর ধারণা অর্জন করি আমরা। সমাজপতির স্ত্রী, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের কর্ত্রী এবং দায়িত্বপরায়ণ তবে মমতাময়ী জননী হিসেবে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ এক নারীর অবয়বই পাঠকের সামনে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কটিও সে সময়ের যেকোনো গ্রামীণ বাঙালি নারীর মতোই। স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব ছিল না। স্বামীর আগ্রহে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীর কাছে সে অক্ষরজ্ঞান লাভ করে। রাতে তাদের নবজাতক সন্তান যখন ঘুমাত তখন পরম ধৈর্যে স্ত্রীকে পড়ালেখা শেখাত তার স্বামী, স্ত্রীর অনাগ্রহ দেখলে কঠোরও হতো। আর এভাবেই অক্ষরজ্ঞান আয়ত্ত করে সে–

> পেথম পেথম বানান করে করে, পরে এমনিতে সব পড়তে পারতাম। বাড়িতে 'বঙ্গবাসী' বলে একটো কাগজ আসত পোস্টাপিস থেকে। ভালো বুঝতে না পারলেও সেটো কখনো-সখনো পড়তাম। কিন্তুক সবই লুকিয়ে লুকিয়ে।[৮]

গার্হস্থ্য জীবনের আপাত-নিস্তরঙ্গ, ঘটনাবিহীন জীবনের মধ্যেও সংসারের নানা বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অবস্থান সমাজ সচেতন আর প্রখর ব্যক্তিত্ববান এক নারীর পরিচয়কেই ধীরে ধীরে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করে তোলে। পরিবারে 'মেজ বউ' নামে পরিচিত এই নারীর নানা পর্যবেক্ষণ আর আত্ম-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে ফুটে উঠতে থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রে ঘটে চলা নানা ঘটনার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের কথা বলা যায়। যেসব তরুণ যুবক স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে তাদের এবং তাদের প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি, উভয়ের সম্বন্ধেই কথকের মন্তব্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মমতাময়ী বাঙালি নারীর দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়–

> কত্তার কাছে শুনেছেলম, জানকে জান মনে করে নাই, কতো লোক–সায়েব মারতে গেয়েছে–সায়েব হয়তো মরেছে, হয়তো মরে নাই–নিজের নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছে যেন খোলামকুচি। উদিকে যে সায়েব মরেছে কি লোভে সি সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে ই দ্যাশে এয়েছে তা কে বলবে? তা সি-ও তো কুনো মায়ের পুত, সেই মা-ও তো একদিন জানবে যি তার বুকখালি হয়েছে।[৯]

মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত মানুষ এদেশে তৈরি কাপড় পরতে শুরু করেছে। সমাজপতি হিসেবে কথকের স্বামীও একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ। বাড়ির সবার জন্য মোটা কাপড় এনে দিয়েছে সে, সবাই পরছেও। কথকেরও তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এ নিয়ে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া সেটিও আটপৌরে এক বাঙালি নারীরই মনোভঙ্গির পরিচায়ক–

> দিশি জিনিস খাব, দিশি জিনিস পরব। মোটা ভাত, মোটা কাপড়। সেই লেগেই এই কাপড়। এই আমাদের পরতে হবে। তা পরছি সেই কাপড়, কত্তারাও পরছে মোটা খদ্দর। তাই বলে বাড়িতে আর চরকায় সুতা কাটতে পারি নাই। যাকগো, কতো হুজুগ দেখলাম এই বয়সে।[১০]

এরই মধ্যে সান্নিপাতিক জ্বরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে বিপর্যস্ত করে তোলে। পুত্রের অসুস্থতার সূচনা থেকে শুরু করে ক্রমশ অসুস্থতা বাড়তে থাকা, মায়ের উদ্বেগ এবং তার অন্তিম সময়ের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা পাঠকের হৃদয়কেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। যে গুমোট, রৌদ্রময় দ্বিপ্রহরে পুত্রের জীবনাবসান হলো সেটি কীভাবে সেই নারীর জীবনাভিজ্ঞতাকে চিরদিনের মতো বদলে দিল তারই অসাধারণ বর্ণনা–

> দোপরটো যি কেমন করে পেরুইলো তা বলতে পারব না। সিদিন দোপরটোই আজরাইল হয়ে এয়েছিল। বুকের ওপর সেই যি বসল আর সরলে না। গোটা জীবন পেরিয়ে যেচে, তবু দোপরটা যেচে না।[১১]

এ সবই সন্তানহারা, সাধারণ এক নারীর আকুতি, বাংলার ঘরে ঘরে যার উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু মেঘে ঢাকা আকাশের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুৎঝলকের মতো আপাত-সাধারণ এই নারীর যেসব উজ্জ্বল উপলব্ধি সেটিই তাকে সাধারণের গণ্ডি ছাড়িয়ে অসাধারণ করে তোলে এবং রক্ষণশীল এক বাঙালি মুসলিম নারীর প্রখর জীবনোপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত করে তোলে আমাদের। স্বামী-সংসার-পরিপার্শ্ব নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্ট এই নারীর মনের মধ্যেও গুমরে মরে এক অপ্রাপ্তির বোধ। দারিদ্র্যের করাল গ্রাসের মুখোমুখি হতে হয়নি তাকে, অন্য অনেক বাঙালি নারীর মতো শিকার হতে হয়নি গার্হস্থ্য নির্যাতনেরও, কিন্তু কেবল ঘর-সংসার সামলানোই কি একজন নারীর জীবনের

সার্থকতা? এর বাইরেও কি আছে এক বৃহৎ জীবন, মহত্তর কোনো অর্জন? এমন ভাবনা মাঝেমধ্যে থমকে দেয় তাকে—

> সারা জেবনে বাড়ি থেকে তিন কোশ চার কোশের বেশি যেতে হয় নাই। কেউ নিয়ে যায় নাই। মাঠ-ঘাট, ঘরবাড়ি, আসমান-জমিন ওইটুকুনই যা দেখলম। কবর কেমন হবে জানি না তবে মনে হয়, কবরের থেকে একটু বড়ো এই সোংসার। কবরের জায়গাটো তবু নিজের, সোংসারের সবটো নিজের লয়। সোংসার তেকে যা দেখা যায়—আসমান-জমিন—সি তো কবরের বাড়া![১২]

এ উপন্যাসের আখ্যান-বর্ণনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন মন্বন্তরের কথা এসেছে নানাভাবে। পল্লিবাসী অধিকাংশ মানুষের মতো বিশ্বযুদ্ধের কার্য-কারণ বা অভিঘাত প্রথমে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে সে, ফলে স্বামীর উদ্দেশে মন্তব্য করেছে, 'কতো দূরে যুদ্ধ হচে, আমরা ইয়ার কি বুঝব? উ নিয়ে তুমি অত মাথা ঘামাইছ ক্যানে?' তবে সময়ের পরিক্রমায় যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সে-ও সরাসরিই প্রত্যক্ষ করেছে। অবস্থাপন্ন পরিবারের সদস্য হওয়ায় খাদ্য-বস্ত্র নিয়ে প্রথমে নিজেরা সমস্যার মুখোমুখি না হলেও গ্রামের সিংহভাগ মানুষের ওপর আকালের প্রভাব প্রতিক্রিয়া তাকে বিচলিত করেছে—'বাঁচতে মানুষের বেশি কিছু লাগে না—তবু দু-একটি যা লাগে তার অভাব হলেই ভয়ানক কাণ্ড! কাপড় নাই, এর পর আর একটাই জিনিস যেমন ধরো ভাত নাই, তখন কি হবে?' কেন এই মহাসমর, কোন কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন হিংস্র আর যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠেছে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, কিন্তু ভ্রাতৃঘাতী এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সে সহজেই উপলব্ধি করতে পারে—

> এখনকার যুদ্ধই এইরকম, কিসের সাথে কিসের যোগ তুমি-আমি জানতেই পারি না। মাটি পাথর হচ্ছে, কেউ জানে না, তারপর দেখবে একদিন তামাম মাঠই পাথর—চাষবাস সব শেষ![১৩]

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পরিণতিতে আকালের থাবা ক্রমেই বিস্তৃত হতে লাগল। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্যের অভাবে না খেয়ে কাটাতে শুরু করল দরিদ্র মানুষ। অবশেষে আকালের প্রভাব পড়ল কথকের পরিবারের ওপরও। যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ খাদ্যসংকটের পাশাপাশি গ্রামে দেখা দিল তীব্র বস্ত্র-সংকট। সুতোর অভাবে তাঁত শিল্পও বন্ধ। বাজারে বিদেশি কাপড় আসা বন্ধ। বস্ত্রের অভাবে অসহায় মানুষরা চুরি-ডাকাতির মতো নানা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে গ্রামের মানুষদের জীবনে দেখা দেয় চরম বিপর্যয়। কথকের ভাষায়—

> ... চারিদিকে হাহাকার হচে, কাপড় নাই, মেয়েদের পরনে কিছুতেই কাপড় জুটছে না। কোথাকার মেয়েরা লিকিন কাপড়-বিহীন ন্যাংটো থাকছে। সে গাঁয়ে মেয়েরা দিনে তো কথাই নাই, রেতেও বাপ-ভাইয়ের ছামনে বেরুইতে পারছে না।[১৪]
>
> এইবার খবর আসতে লাগল খুব কাপড় চুরি হচে। লতুন কাপড় লয়, পুরনো কাপড়ই চুরি হচে। সোয়ামি-স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে, ভাঙা দুয়োরটো ঠেসানো—সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছে বউটির পরনের একটি কাপড় কে নিয়ে গেয়েছে।[১৫]

যুদ্ধের ফলে গ্রামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব শুরু হয়েছে— পরনের কাপড় নেই, তেল, নুন চিনি কেরোসিন কিছুই নেই। শুধুমাত্র গ্রামে যেসব জিনিস উৎপাদিত হতো চাল, ডাল, মশলা এসব রয়েছে। তাও আবার যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল বা গৃহস্থ তাদের হয়ত কিছু আছে, কিন্তু গরীব

মানুষদের তাও নেই। এমতাবস্থায় 'যার খ্যামতা আছে, কুনোরকমে দুটো চাল ফুটিয়ে মাড়সুদ্দু খেচে, ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে' আর যার নেই সে এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে ভাতের মাড়টুকুন চেয়ে খাচ্ছে কিংবা একপ্রকার না খেয়েই দিনাতিপাত করছে।

একে তো যুদ্ধ, আকাল, মহামারি তার ওপর শুরু হয়েছে অনাবৃষ্টি, খরা, অতিবৃষ্টি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। ফসল উৎপাদনে প্রকৃতির ওপর তারা পুরোপুরি নির্ভরশীল। প্রকৃতিতে অনাবৃষ্টি হলে খরা দেখা দেয়, ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় আবার অতিবৃষ্টিতেও ফসল উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে পরপর দু'বছর ফসল উৎপাদন না হওয়ায় জীবনধারণকে আরো কঠিন করে তুলল। প্রলম্বিত মহাসমর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলল। চারদিকে খাবারের অভাবে মানুষের হাহাকার। কথকের ভাষ্যে–

> নাই, নাই কিছুই নাই। হেলেঞ্চা শাক, কলমি শাক, শুষুনি শাক যা সব যেখানে সেখানে পাওয়া যেত, যে খুশি নিয়ে যেত। অ্যাকন সিসব সারা গাঁ খুঁজে কোথাও পাবার উপয় নাই। আচ্চয্যির কথা–গাধাপুইনি, খইলুটি শাক যি শাক, যা কেউ খেত না, গরু-ছাগলেও না, সেই শাকও গরমিল। যার সজনে কি একটো ডুমুর গাছ আছে, সে অ্যাকন একটো শজনের পাতা, একটো ডুমুরও কাউকে দেয় না।[১৬]

দুর্ভিক্ষের প্রভাবে মানুষ কীভাবে তাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সেটি চাক্ষুষ করে কথক বিপর্যস্ত বোধ করেন। মনুষ্যত্ব থেকে পশুত্বের পর্যায়ে এই মর্মান্তিক রূপান্তর মানবিকতার মৌল চেতনা সম্বন্ধেই তাকে সন্দিহান করে তোলে। 'কুকুর-বেড়ালের ছেঁড়াছিড়ি দেখে রাগ করি কিন্তুক মানুষ কুকুর-বেড়ালের চাইতে কিসে ভালো? মূলে টান পড়লে সবাই সমান। সেই মূল হচে প্যাট'–তার এহেন উপলব্ধি পাঠকেরও চেতনার মর্মমূলে আঘাত হানে। মানবতার চরম পরাজয়ে বিপর্যস্ত বোধ করেন তারাও। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়ায় কথকের শ্বশুরবাড়ির বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারটিও ভেঙে যায়, ভাইয়েরা সবাই পৃথক হয়ে যায়, যা তার জন্য বড় ধরনের আঘাত হয়ে আসে। দেবর-ননদ-জা সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে পারস্পরিক প্রীতিও সৌহার্দ্যের যে পরিবেশে কথক অভ্যস্ত ছিলো তার আকস্মিক অবসান বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই ধরা দেয় তার কাছে।

ওদিকে রাষ্ট্র-রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্ত তার নিজের খেয়ালে ঠিকই ঘটে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ডামাডোল শেষ হতে না হতেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এই দাঙ্গার পেছনে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক অবিশ্বাস যেমন দায়ী তেমনি দায়ী শাসকশ্রেণির কূটকৌশল। সাধারণ মানুষ সেটি স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলেও সে-সময়ের সচেতন মানুষদের কাছে এটি গোপন থাকেনি। ব্রিটিশদের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ও বিস্তার সম্বন্ধে সমালোচকের ভাষ্য–

> বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে যে সংবিধান সংশোধনগুলি হয়েছিল তা সাম্প্রদায়িকতাবাদ আরও বাড়িয়ে তোলে। সেগুলির ফলে যে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পাওয়া গিয়েছিল তাও তখন ঐ বিভেদের লড়াইয়ে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যেত।[১৭]

হিন্দু ও মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিস্তারও পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে উৎসাহিত করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুঁজির মালিকানা লাভ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মধ্যবিত্তদের একটি অংশ সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজনের সুযোগ নেয়। সমালোচকের ভাষায়–

> একবার চালু হওয়ার পরে সাম্প্রদায়িক চেতনাই হয়ে ওঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। পরে গ্রামাঞ্চলে মধ্য ও ধনী কৃষক বা ছোট ভূস্বামীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হল এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা দ্রুত শহর থেকে গ্রামে বিস্তার লাভ করল।[১৮]

এ উপন্যাসের অন্যতম এক অনুষঙ্গ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। আবহমানকাল ধরে ভারতবর্ষের এ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করলেও সময়ের পরিক্রমায় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়, যা থেকে দাঙ্গার মতো ভয়াবহ ঘটনাও ঘটে। কলকাতা বা ঢাকার মতো বড় শহরগুলোতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি অনেক বেশি পরিদৃষ্ট হলেও বাংলার নিভৃত গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনকে এটি সেভাবে স্পর্শ করেনি। *আগুনপাখি* উপন্যাসের কথক নারীও তাই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কার্যকারণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। শত শত বছর ধরে মিলেমিশে বসবাস করার পর হঠাৎ কেন দুটো সম্প্রদায় পরস্পর-বিরোধী হয়ে উঠল সেটিই তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে–

> ...হিঁদু-মোসলমানে তফাত আছে কি নাই তা নিয়ে এত ভাববার কি দরকার? সি তো ধম্মে ধম্মে অ্যানেকই তফাত। কেরেস্তানের সাথে হিঁদুদের তফাত নাই? কেরেস্তানের সাথে মোসলমানের নাই? বলে হিঁদুতে হিঁদুতে কতো তফাত তারই ঠিক নাই! মুসলমানে মুসলমানে কি তফাত নাই? এক সোংসারে একজনার সাথে আর একজনার কত তফাত। উসব নিয়ে ভেবে লাভ আছে?[১৯]

আগুনপাখি উপন্যাসেও আমরা সাম্প্রদায়িকতার এই বিস্তারের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি, যদিও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেমন করেছিল এ উপন্যাসের কথক। হিন্দুপ্রধান গ্রামে সংখ্যালঘু মুসলিম হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলেও পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে তিক্ততার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় সাম্প্রদায়িকতার ক্রমঘনায়মান বিষবাষ্প কথককে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে তোলে। কেননা তাদের গ্রামে মাত্র বিশ ঘর মুসলিম, অন্যদিকে হিন্দু কম করে হলেও পাঁচশো ঘর। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা শুনে নিজ এলাকাকে নিয়ে অমঙ্গল আশঙ্কাও দেখা দেয় তার মনে। সে ভাবে, যদি এই গ্রামে দাঙ্গা লাগে তাহলে 'এই কটি মোসলমান তো এক লাপটেই মারা পড়বে।' বছরের পর বছর হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করতে দেখার পর দুই সম্প্রদায়ের এই যুদ্ধংদেহী মনোভাব তাকে একইসঙ্গে ব্যথিত ও শঙ্কিত করে তোলে। তার উদ্বিগ্ন ভাবনা–

> কোথা কুন পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি দুনিয়ার কুন এক কোণে, চাঁদ-সুরুজ যিখানে চুপে-চুপে ওঠে, চুপে-চুপে ডোবে, চুপে-চুপে ধান হয়, গম হয়, ফল-পাকুড় হয়, চুপে-চুপেই আমাদের সন্তান হয়, বাড়ে, মরে। আমরা কার কি করেছি যি সেই গাঁয়ের এক মায়ের অন্ধের নড়ির পুতকে কেটে দুখান্ডা করে দেবে?[২০]

অন্যত্র–

> এক হিঁদু মায়ের পুতকে মারছে একজনা মোসলমান আবার এক মোসলমান মায়ের পুতকে মারছে একজনা হিঁদু। আঃ হায়রে! মানুষ লিকিন বুদ্ধিমান পেরানি।[২১]

একইসঙ্গে দেশভাগের জল্পনাকল্পনাও তাঁর ভাবনারাজ্যের বড় একটি অংশ জুড়ে থাকে। কেবল ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে একটি জাতিকে দুটো রাষ্ট্রে ভাগ করার পরিকল্পনাটি তাঁর কাছে অযৌক্তিক মনে হতে থাকে। হিন্দু আর মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্র কেমন হবে, কী হবে এসব রাষ্ট্রের চরিত্র–এমন নানা ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রাজনীতির মাঠ গরম করে রাখা বড় বড় নেতারা যেসব প্রশ্ন মুখে আনছেন না সেসব বিষয়ও তার মনে দোলা দিয়ে যায়–

> তবে খালি মনে হতে লাগল মোসলমানের দ্যাশ হবে অথচ সব মোসলমান সিখানে থাকবে না, এমনও হতে পারে যি আমি থাকব কিন্তুক আমার সোয়ামি ছেলেমেয়ে থাকবে না। তাই যদি হয় তাইলে ই কাজ করতে যেয়ে হিঁদু-মোসলমান সম্পক্ককে বিষ বিষ করতে হবে ক্যানে?[২২]

যুক্তি ও বুদ্ধির নিক্তিতে মাপলে ধর্মের ভিত্তিতে এই দেশভাগ সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, কিন্তু তার অসহায় দৃষ্টির সামনে ক্রমশ হিন্দু-মুসলিমের মতদ্বৈধতা বাড়তে থাকে, একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। দেশভাগ একসময় যাদের কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে তারাও হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নেয়। তার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও রাজনীতি-সচেতন স্বামীও সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে অসহায় বোধ করে। স্ত্রীর উদ্দেশে তার মন্তব্যে এই অসহায়ত্বের বোধ প্রকাশিত হয়–

> এ এমন আগুন লেগেছে, আমি তো আমি, হিন্দু-মুসলমানের কোনো নেতাই এখন আর এই আগুন সামলাতে পারবে না। খেলা করতে গিয়েছিল আগুন নিয়ে। এখন সে আগুনে দেশ পুড়ে ছারখার হচ্ছে এ তাদের দেখতেই হবে।[২৩]

ক্রমেই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের আঁচ পৌঁছে যায় এই গ্রামেও। লাঠি কাটারি গাঁইতি শাবল নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল দুই সম্প্রদায়ের যুদ্ধোন্মত্ত মানুষেরা। অন্যান্য জায়গা থেকেও খবর আসতে লাগল সংঘাত এবং রক্তপাতের। কথকের ভাষায়–'খবর সোমানে আসতে লাগল। হাজার হাজার মোসলমান যেমন মরছে হাজার হাজার হিঁদুও লিকিন তেমন মরছে। কারা কম, কারা বেশি ভেবে লাভ নেই।' শুভ আর মনুষ্যত্ববোধকে ছাপিয়ে বিষাক্ত সাপের মতো ফণা মেলল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, যা গ্রাস করল সিংহভাগ মানুষকে। এক পর্যায়ে তার নিজের সন্তানেরা, এমনকি সমস্ত প্রতিকূলতার মুখে ছায়া হয়ে দাঁড়ানো স্বামীও তাকে ছেড়ে চলে গেল পূর্ব-পাকিস্তানে। স্বজন-সন্তানদের বারংবার অনুরোধ, আকুতি সত্ত্বেও কথক রয়ে গেল তার ভিটে আগলে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের যৌক্তিকতাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না সে। তার অনড় উপলব্ধি–

> একই দ্যাশ, একইরকম মানুষ, একইরকম কথা, শুদু ধম্মো আলেদা সেই লেগে একটি দ্যাশ হয়ে গেল, ই কি কুনোদিন হয়? এত লাগোয়া মাটি, ইদিকে একটি আমগাছ একটি তালগাছ, উদিকেও তেমনি একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল? কই ঐখানটোয় আসমান তো দুরকম লয়।[২৪]

আর এভাবেই কথকের আত্মচেতনার গভীর এক জাগরণের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে *আগুনপাখি* উপন্যাসের। কথক উপলব্ধি করে, স্বামী-সন্তান-আত্মীয়-স্বজন সবাই তার যত ঘনিষ্ঠই হোক, সমস্ত সম্পর্ককে ছাপিয়ে তার একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্বের কাছেই তার দায়বদ্ধতা এবং

সেই দায়বদ্ধতা পূরণের তাগিদেই সে বরণ করল একাকিত্ব, যাবতীয় অনিশ্চয়তাকে মাথা পেতে নিয়ে সে রয়ে গেল পুরনো ভিটেতেই। উপন্যাসটির এই সংকেতময় উপসংহার লেখক হাসান আজিজুল হক সম্বন্ধে সমালোচকের বক্তব্যের সারবত্তাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে– 'তিনি মানুষের প্রতিরোধের শক্তি, আশাবাদের শক্তিকে একটি বড় শক্তি হিসেবে দেখেছেন।'[২৫] *আগুনপাখি* সেই স্পর্ধিত আশাবাদেরই স্মারক। লেখকের নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতা এ উপন্যাসের অণু-পরমাণুতে মিশে আছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় বাস্তুচ্যুত হয়ে আসার যে যন্ত্রণা এবং তার পরিণতিতে অস্তিত্বের যে মৌলিক সংকট সেটিই তিনি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন।

বিশ শতকের উষালগ্নে, নারী যেখানে তার জীবনধারণসহ অস্তিত্বরক্ষার সামগ্রিক প্রয়োজনে পুরোপুরি পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, তার নিজস্ব 'সত্তা' বলে যেখানে কিছুর অস্তিত্ব নেই, এমনই এক সময়-পরিসরে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের এক নারী দেশ-জাতি-সমাজ-সমকাল নিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছে এবং সে উপলব্ধিকে সোচ্চারে ঘোষণা করছে, এমন নজির বাংলা সাহিত্যে বিরল। সে দৃষ্টিকোণ থেকে *আগুনপাখি* উপন্যাসের নামহীন কথক নারী জাগরণে এক স্বয়ম্ভু প্রতিনিধি। সমালোচকের ভাষায় :

> নারীর এমন দাঙ্গা, যুদ্ধ ও রক্তপাতবিরোধী উপলব্ধি ও অবস্থান বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ দৃষ্টান্ত। এই নারী অখণ্ড ভারতমাতার প্রতীক। তার 'আমিত্ব' ও 'ব্যক্তিত্ব'কে লেখক এমন একটি শক্ত জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেন, যেখানে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংস্কার সবকিছুই তার বাধ্যগত। তিনি ইচ্ছেমতো গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান, ভাঙচুর, নির্মাণের অধিকারী হয়ে ওঠেন। এই শক্তির জোরে দেশভাগকে প্রত্যাখ্যান করেন, যুদ্ধ ও দাঙ্গাবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন, স্বামী-সন্তানেরা দেশত্যাগ করলেও একাই থেকে যান।[২৬]

সামগ্রিক বিচারে *আগুনপাখি* কেবল দেশভাগ কিংবা বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের আখ্যান নয়, এ উপন্যাস আত্ম-উপলব্ধি ও চেতনার গভীরতম উন্মেষেরও। ধর্ম আর জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা চোখে আঙুল দেখিয়ে দেয় এ উপন্যাস এবং এ সত্যটিকেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে যে, তত্ত্ব আর রাজনীতির জটিল কূটচাল নতুন মানচিত্র আর রাজনৈতিক সীমারেখা তৈরি করতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের শাশ্বত উপলব্ধিকে কখনোই পরাজিত করতে পারে না।

তথ্যনির্দেশ

১ হাসান আজিজুল হক, 'মাকে দেখে লিখেছিলাম আগুনপাখি', দৈনিক প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০১৮

২ প্রাগুক্ত

৩ স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ রজতজয়ন্তী বর্ষ, ১১ মার্চ ২০০০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১১১

৪ সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৩২১

৫ স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৬ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ: ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪, জুন ১৯৯৭, পৃ. ২৩

৭ কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, প্রথম প্রকাশ ১৩ মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৫৩-৫৪

৮ হাসান আজিজুল হক, *আগুনপাখি*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩৫

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

১৭ দেবারতি সিকদার, *স্মৃতিকথা: প্রেক্ষিত বঙ্গবিভাজন*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৩৪

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৯ আগুনপাখি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

২৫ জাহানারা নওশিন, *ছোটগল্পে হাসান আজিজুল হকের জীবনসাধনা*, প্রথম প্রকাশ, ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৮৭

২৬ চন্দন আনোয়ার, *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৪